দাবি : সামগ্রিক উন্নয়ন

রানা

শিল্পায়ন নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনেক আলোচনা শুনে আসছি। শিল্পায়নের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়, এটাও শুনেছি। যে অঞ্চলের শিল্প গড়ে উঠে, সেখানকার আর্থ - সামাজিক চিত্র বদলে যায়। এলাকার মানুষেরা এক উন্নত জগতে প্রবেশ করে। ইত্যাদি ইত্যাদি...। এগুলো আপনারাও শুনেছেন, পড়েছেন। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আপনাদের কান তেতো করতে চাই না। আমি এক শিল্পনগরীর আদিবাসী। জন্ম থেকে কর্ম পুরো জীবনটাই শিল্পাঞ্চলেই কেটেছে। কৃষিজমি দেখেছি। শস্যক্ষেত্র দেখেছি। খেতে শস্য কীভাবে হয় জানি না। জানার চেষ্টাও করিনি। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোনটা লাভজনক জানি না। কৃষি নিয়ে কিছুই জানি না। কৃষকের জীবন জানি না। কৃষির উপর গড়ে ওঠা গ্রাম সভ্যতার জীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তাই 'কৃষি, না শিল্প'? কোনটা ভালো বলতে পারব না।

তবে আমি ইন্ডাস্ট্রি বুঝি। কয়লা, স্টিল, কংক্রিট, জুটমিল এই শব্দগুলো আমরা খুব ভালো বুঝি। একটা মালগাড়িতে কত টন কয়লা ধরে, খুব ভালোভাবে জানি। স্টিল, বিদ্যুৎ তৈরির প্রক্রিয়াগুলো আমাদের অঞ্চলের খুব 'কম জানা' মানুষেরাও টেকনিক্যালি অনেক নিখুঁতভাবে বলতে পারবে।

আমি আসানসোল - দুর্গাপুরের মতো এক অতি শিল্পোন্নত অঞ্চলের কথা বলছি। 'কৃষি ভাল, না শিল্প' একথা শুনতে মিডিয়া, বুদ্ধিজীবিরা গ্রামে যেতে পারেন। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষদের থেকে শিল্প নিয়ে বক্তব্য শুনতে পারেন। কিন্তু এই মহা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আমরা 'অচ্ছুৎ' থেকে যাই। ভারতের এক অন্যতম শিল্পোন্নত অঞ্চলে মানুষদের কথা কেউ শুনতেই চায় না। কৃষি নিয়ে কৃষিজীবী মানুষেরা বলতে পারেন। কিন্তু শিল্প নিয়ে সবচেয়ে ভালো বলতে পারি আমরা। আমাদের কথা এই বিতর্কে কোনও নূতন মাত্রা যোগ করতে পারে। তবুও আমরা কেন নয়?

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে প্রথম শিল্পায়নের সূচনা হয় আমাদের অঞ্চলে কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (বিশেষ করে অধুনা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের) ভূমিপুত্রদের জোর করে বা ভুলিয়ে এখানে এনে কয়লা উত্তোলনের কাজে নিয়োগ করা হয়। তাদের হাত ধরে কোল মাইন শিল্প বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে ওড়িশার প্রান্তিক মানুষেরা ঝাঁকে ঝাঁকে কয়লাখনিতে নামতে শুরু করে। প্রত্যক্ষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। মাটির উপরেই মূলত তারা কাজ করত। বাউরি, বাগদি, কোড়া সম্প্রদায়েরা ধীরে ধরে খনিতে নামতে শুরু করে। একটু উঁচু গোছের বাঙালিরা ইংরেজদের অধীনে করণিক বা বাবুগিরির কাজ করত। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টেছে। খনিতে উন্নত গোত্রের (?) বাঙালিদের উপস্থিতিও উল্লেখ করার মতো। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বেসরকারি মালিকানাধীন সমস্ত কয়লাখনি সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড গড়ে ওঠে। আমাদের অঞ্চলের খনিগুলি ইস্টান কোলফিল্ড লিমিটেড এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় অসংগঠিক, অসুরক্ষিত এবং কম বেতনভোগী শ্রমিকেরা সচ্ছল শ্রেণিতে উন্নীত হয়। সরকারি খনিতে এক কায়িক শ্রম দেওয়া মানুষ যা রোজগার করে, তা সেক্টর ফাইভের ঝাঁ চকচকে অফিসওয়ালাকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। লজ্জায় যাতে না পড়েন, তাই বেতনও আনুষঙ্গিক সুযোগ - সুবিধার কথা চেপে গেলাম। তবে গত কয়েক বছরে বেসরকারি উদ্যোগে কয়লা উত্তোলন এবং সরকারি খনির বেসরকারি হস্তান্তর শুরু হয়েছে। ফলে কয়লাঞ্চলে এখন দু'টি শ্রেণিবিভাগ গড়ে উঠেছে। সংগঠিত ও অসংগঠিত। এই দুই দলের মধ্যে ব্যবধান কয়েক আলোকবর্ষের। এর নাম নব্য শিল্পায়ন।

এছাড়া স্বাধীনতার পরে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার মাধ্যমে দামোদর নদের উপর বিভিন্ন বাঁধ গড়ে উঠতে শুরু করে। সরকারি নিয়ন্ত্রাণাধীন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। দুর্গাপুরে স্টিল প্ল্যান্ট গড়ে ওঠে। দুর্গাপুর শিল্পনগরীর পত্তন শুরু হয়। স্বাধীনতার আগে বীরেন মুখার্জী কুলটিতে ইস্কো গড়ে তোলেন। কুলটি ও বার্নপুরে ইস্কোর মাধ্যমে স্টিল উৎপাদন শুরু হয়। স্বাধীনতার আগে বীরেন মুখার্জী কুলটিতে ইস্কো গড়ে তোলেন। কুলটি ও বার্নপুরে ইস্কোর মাধ্যমে স্টিল উৎপাদন শুরু হয়। দুর্গাপুরে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার, এম. এ. এম.সি., চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্থান কেব্‌লস এবং আরও অনেক ভারী শিল্প গড়ে ওঠে। এদের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অনুসারী শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। দামোদর, জিটি রোড, কয়লা, হাওড়া - দিল্লি রেলপথের উপর ভর করে আসানসোল - দুর্গাপুর এক নূতন শিল্পাঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯১ -এর উদার অর্থনীতির হাত ধরে এই অঞ্চলেরও পরিবর্তন হতে শুরু করে। বেসরকারি উদ্যোগে ছোট - বড় কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে আই টি ও কল সেন্টারেও বিনিয়োগ শুরু হয়েছে।

এতটা পড়ে আপনারা হয়তো চিন্তা করছেন, বর্তমান শিল্পায়নের কথা বলতে গিয়ে পুরনো দিনের কথা কেন? দরকার আছে। পুরাতন শিল্প ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিল্পায়ন এই দুটো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সন্ধিক্ষণ আমরা দেখেছি। এই রাজ্যে শিল্পায়নের সন্ধিক্ষণে আমরা সবথেকে অভিজ্ঞ মানুষ। এখানকার অভিজ্ঞতা জানানোর জন্য, পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য বলার দরকার ছিল।

আমরা শিল্পায়নের পক্ষে ছিলাম। অন্য জায়গায় শিল্পের জন্য জমি দিতে আপত্তি থাকতে পারে। আমরা শিল্পের কথা শুনলে আগে বাড়িয়ে জমি দিতে উৎসুক হই। 'মা - মাটি - মানুষের' মতো একটা কারখানা আমাদের মা। আমরা মাটির গুণ বুঝি না, কিন্তু শিল্পের মর্ম বুঝি।

সিঙ্গুর - নন্দীগ্রামের কয়েক বছর আগে আমাদের শিল্পাঞ্চলে ভাঁটার টান দেখা যায়। খনি থেকে কারখানা ধুঁকতে শুরু করে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পক্ষেত্রগুলোতে মানুষ ছাঁচাই এর সাথে পরিচিতি থাকলেও, আমাদের অভিজ্ঞতায় ছিল না। 'স্বেচ্ছাবসর' নামক প্রকল্পের মাধ্যমে এখানকার মানুষও শিল্প থেকে ছাঁটাই হতে শুরু করে। দুর্গাপুরকে একটা সময় বলা হতে শুরু করে ভি.আর.এস. (ভল্যুন্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম) নগরী। সেই সময়ে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। আমরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠি। স্বেচ্ছায় কোম্পানিকে জমি দিতে থাকি। পরে কারখানায় উৎপাদন শুরু হলে, চমকে উঠি। তারও পরে গর্জে উঠি। কারখানা আমাদের মা। কিন্তু এ কিসের কারখানা। শিল্পের এ কিসের অত্যাচার? কারখানার কালো ধুলো আমাদের বাড়ির ছাদে, উঠোনে, মাথায়, বাইরে মেলা জামাকাপড়ে। কালো ধোঁয়া ঢেকে দেয় আমাদের গর্বের জিটি রোডকে। ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয় আমাদের ফুসফুস। কারখানার বিষাক্ত জল আমাদের সামান্য কৃষিজমি, আমাদের অঞ্চলকে নষ্ট করতে শুরু করে।

এই অবস্থারও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। আমাদের ঘরের পাশের অত বড় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। কই, আমাদের সেরকম কোনও কষ্ট দেয়নি। তবে এই সামান্য কয়েক একর জুড়ে গড়ে ওঠা ইস্পাত কারখানার এত উৎপাত! শিল্প

আমাদের ধাক্কা দেয়।

প্রথমে ছাঁটাই, পরে দূষণ। তখন আমার মনে প্রশ্ন এসেছিল কৃষকেরা তো ছাঁটাই হয় না, তবে শ্রমিকেরা কেন? কৃষিজমিতে দূষণ হয় না, তবে শ্রমিকেরা কেন দূষণের শিকার হয়? শুধু শ্রমিকেরা নয়, কারখানা পার্শ্ববর্তী সকলেই।

২০০০-২০০৭ দূষণের বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠি। কথার ভুল ব্যাখ্যা যেন না হয়। আমরা শিল্পের বিরুদ্ধে নয়, শিল্পের দূষণের বিরুদ্ধে বলেছিলাম। অহিংস পথে ছিল আমাদের আন্দোলন। হাতে সামান্য ব্লেডও ছিল না। কারও ঝান্ডাও আমাদের হাতে উঠে আসেনি। তবুও পুলিশের বীভৎস অত্যাচারের শিকার আমরা হয়েছিলাম। ঘরে ঘরে ঢুকে পুলিশের মারধর, হুলিগ্যানিজমের নামে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া, এলাকা ছাড়া করা, সবের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন আমাদের কথা কেউ শোনেনি। সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, কেউ না।

খুব সম্প্রতি দুর্গাপুরের মেয়র, বিধায়ক, প্রশাসনিক ব্যক্তি থেকে মন্ত্রী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন স্পঞ্জ কারখানা গড়তে দেওয়া ভুল হয়েছিল। আর নূতন কোনও কারখানা গড়তে দেওয়া হবে না। কিন্তু পুরনো কারখানাগুলোর দূষণ? সরকারের কুম্বীরাশ্রু, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কিছু কেতামাফিক সাবধান বাণী। ব্যস। দূষণ একই জায়গায়। বিষ পান করছি আমরা। তামাম রাজ্য চুপ। পুলিশ, শাসকদল, সরকারের চোখ রাঙানিতে আমরাও এখন বোবা রোগী। রোগে শেষ হওয়ার প্রত্যাশায় থাকা শিল্পাঞ্চলের মানুষেরা। শিল্পাঞ্চলের মানুষদের যে শিল্পের বিরুদ্ধে বলতে নেই।

শিল্প হলে প্রচুর মানুষ কাজ পায়। কথাটা পুরোপুরি সত্যি। আমরা তার সাক্ষী। এলাকায় জীবনযাত্রার মান প্রচুর উন্নত হয়। আমাদের অঞ্চলে এমন কোনও বাড়ি নেই, যেখানে মানুষ শিল্পের সাথে যুক্ত নয়। কিন্তু এখন নব্য শতকের শিল্পায়ন? আমাদের, এলাকার যুবকেরা, শিক্ষিত, ঐতিহ্যশালী দক্ষ শ্রমিকেরা কাজের খোঁজে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, নয়ডা, পুনে, চেন্নাইতে। আমাদের এখানে বসে আপনি যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই দেখবেন কারখানার ধোঁয়া ওঠা চিমনি বা কয়লাখনি। সেখানে আমাদের কাজ নেই। আমাদের দক্ষ পুর্বপুরুষেরা যে শিল্পভূমি তৈরি করেছিল, তাদের ছেলেমেয়েদের কাজ নেই। শিল্পের অভাব নেই। গত শতকের থেকে এই শতকে আমাদের শিল্পাঞ্চলে অনেক গুণ বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বন্ধ কারখানাগুলো আবার নূতন করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। প্রচুর কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পগুলোতে নিয়োজিত হয় বাইরের রাজ্যের মানুষেরা। পানাগড় জাতীয় সড়ক থেকে আসানসোল পর্যন্ত নূতন করে গড়ে ওঠা কারকানাগুলোতে একটা সমীক্ষা করলে দেখা যাবে,৮০-৯০ শতাংশ মানুষ বাইরের রাজ্যের। এর মাধ্যমে আমি কোনওরকমেই আঞ্চলিকবাদের কথা বলছি না। শুধু জানতে চাইছি এলাকায় নূতন কী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হল? এলাকার মানুষেরা কতটা কাজ পেল?

আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলা হয়, আমরা নাকি কর্মক্ষেত্রে অযৌক্তিক দাবিদাওয়া করি। ইউনিয়নবাজি করি। আন্দোলন করি। যারা এই অভিযোগগুলো তোলেন, তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, আমাদের অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য কোন কারখানা বন্ধ হয়েছে?

বরং, আমরা বলতে পারি বন্‌ধের দিনেও আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়ে যাই। যখন ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দল বন্‌ধের দিনে আমাদের কারখানা থেকে জোর করে বের করে দেয়, তখনই কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যাহত হয়। রাজ্যে অন্য অঞ্চলে কর্মসংস্কৃতির পরিবেশ অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু আমাদের কর্মসংস্কৃতি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

বন্‌ধের দিনে মালিক ও সরকার আমাদের কোন নিরাপত্তা দেয়? সুষ্ঠুভাবে কাজ করার কোন পরিবেশ রাখে? বরঞ্চ শাসক পার্টির বন্‌ধে ঝামেলায় না পড়ার পরামর্শ পাই। তাহলে অযৌক্তিক বন্‌ধের জন্য উৎপাদন ব্যাহত হলে, দায়িত্বটা কার?

সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পতে কর্মসংস্থানের হার বর্তমান শিল্পায়নের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। তবুও আমাদের অঞ্চলে এখন যেভাবে শিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানেও এলাকার প্রায় প্রতিটি মানুষ কাজ পেতে পারে। কিন্তু আমরা পাইনি। 'এলাকার মানুষদের কর্মসংস্থান হবে' —সরকারের এই দাবির যৌক্তিকতা কোথায়?

তবুও একটা অংশ কাজ পেয়েছে। আট ঘন্টার নামে বারো - চোদ্দো ঘন্টা ডিউটি। নামমাত্র ওভারটাইম। ছুটি খাতায়কলমে থাকলেও, নেওয়া যায় না। খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন দৈনিক সত্তর থেকে একশো টাকা। কারখানায় সাধারণ শ্রমিকদের মাসিক বেতন তিন থেকে চার হাজার টাকা। নো - ওয়ার্ক, নো - পে। ন্যূতম শ্রম আইন মানে না। ঠিকে শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সাধারণ ধর্মঘটের দিনে শ্রমিকদের ভয় বা লোভ দেখিয়ে চব্বিশ ঘন্টা আটকে রাখা হয়। আমরা তো অতীতে এই অবস্থা র সম্মুখীন হইনি। খনিতে - কারখানাতে অতীতে সম্মানের সাথে কাজ করেছি। বেসরকারি শিল্পে আমাদের অবস্থা পশুদের থেকে কিছুটা ভাল। খাবারের বদলে টাকা পাই, আর পায়ে দৃশ্যমান কোনও শেকল পরানো হয়নি। তবে একটা শেকল পরিয়ে রেখেছে। ছাঁটাই করে দেওয়ার হুমকি। মাইনে কেটে নেওয়ার হুমকি। **এই নূতন শিল্পায়নকে আজ আমরা অসহায় চোখে দেখছি। এতে কার ভালো হচ্ছে জানি না। দু'শো জনের মধ্যে একশো সত্তর জনের মাসিক বেতন তিন থেকে চার হাজার, বাকিদের কুড়ি থেকে এক লাখের উপর টাকা। উন্নয়ন তাহলে কাদের জন্য? কীসের জন্য?**

মে দিবস, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার বিশেষ দিনটিতে কারখানার গেটের বাইরে লাল পতাকা উড়ানো হয়। শ্লোগান ওঠে 'শ্রমিক বিপ্লব জিন্দাবাদ'। তখন ঝাঁ-চকচকে রোডের দু'পাশের পশুখামারগুলির (কারখানা) পশুরা নির্বাক হয়ে জানতে চায়, বিপ্লব কাদের জন্য? নেতাদের শ্রমিক বিপ্লব কোন আদর্শে? শ্রমিকদের জীবনকে আরও পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য? এর নাম কি শিল্পবিপ্লব?

এই লেখা কোনও ব্যক্তিবিশেষ, কোনও আদর্শ, কোনও আন্দোলনের, বিশেষ করে শিল্পায়নের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। নিজের দেখা ও শোনা অবস্থাটা আপনাদের জানানোর জন্য এই লেখা।

আমাদের শিল্পাঞ্চলের মানুষেরা শিল্পের পক্ষে। তবে যে শিল্প মানুষকে পশুস্তরে রূপান্তর ঘটায়, তা কি আমরা চাইব? বন্ধুর মুখে শুনেছি সিঙ্গুরে কারখানা গড়ে তোলার সময়, সুপারভাইজার হিসাবে সে পেত সাড়ে তিন হাজার টাকা। শিল্পের নামে মানুষকে এভাবেই ঠকানো কি কাম্য? শিল্প মানে কি শুধু বিনিয়োগের অঙ্ক? শুধুই বস্তুগত উৎপাদন মাত্রা? শিল্পোন্নয়ন ও মানবোন্নয়ন একই সাথে কীভাবে সম্ভব? শিল্পায়নের সাথে কী মানুষ, পরিবেশ এবং সংস্কৃতির উন্নয়নও সম্পর্কযুক্ত নয়?

আমাদের প্রিয় নেতা-নেত্রীগণ এবং শিল্পপতিরা কিছুদিন 'শিল্প-কৃষির' কবিগান বন্ধ রাখুন না। আপনাদের তরজা অনেক সয়েছি। সহ্যের সীমা বাইরে যাওয়ার আগে নিজেরা সচেতন হোন। এবার একটু চুপ করুন। আমাদের ভোটার নম্বর ভেবে গলাবাজি করা আর আমাদের পছন্দ নয়। আমরা শিল্প-কৃষি শুনতে চাই না। আপনারা সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবুন। আমাদের সকলের জন্য দু'বেলা ভাত - রুটি, পরনের কাপড়, মাথায় একটু ছাদ, ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা, আর খুব সামান্য উন্নত জীবনযাত্রা। ব্যস আর কিছু চাই না। আপনারা শিল্পায়ন, না কৃষির উন্নয়ন কার মাধ্যমে করবেন, সেই দায়িত্ব আপনাদের। আর দায়িত্ব না নিতে চাইলে, আমরা, সাধারণ মানুষেরা তৈরি, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে।